মানসিক ও প্রজনন স্বাস্থ্য

ইউনিট ৭

ভূমিকা

স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল। প্রতিটি মানুষের যেমন দৈহিক স্বাস্থ্য আছে তেমনি মনেরও স্বাস্থ্য আছে। শরীর ভাল না থাকলে আমরা মনের দিক থেকে অসুস্থ হয়ে পড়ি এবং মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়ি, যার বহিঃপ্রকাশ ঘটে আমাদের আচরণের মাধ্যমে। বাস্তব জীবনে ইতিবাচক আবেগীয় অবস্থা এবং মানসিক তৃপ্তি লাভের মধ্যে দিয়ে মানসিক স্বাস্থ্য বজায় রাখা সম্ভব হয়। আর প্রজনন স্বাস্থ্য হচ্ছে মানুষের সামগ্রিক স্বাস্থ্যের একটি অংশ বিশেষ। মায়ের গর্ভ থেকে শুরু করে একটি শিশুর শৈশব, কৈশোর, যৌবন ও প্রৌঢ়জীবন বিকাশের প্রতিটি স্তরেই প্রজনন স্বাস্থ্যের বিষয়টি জড়িত। সুস্থ, স্বাভাবিক, পরিচ্ছন্ন ও নিরাপদ জীবনের জন্য প্রতিটি মানুষেরই প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান থাকতে হবে। আমাদের দেশে মানসিক ও প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতার অভাব রয়েছে তাই প্রতিটি মানুষের মানসিক ও প্রজনন স্বাস্থ্য রক্ষা সম্পর্কে ধারণা থাকা আবশ্যক।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ১ সপ্তাহ**

এ ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-৭.১ : মানসিক স্বাস্থ্যের বৈশিষ্ট্য ও উপাদান
পাঠ-৭.২ : শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য গঠনোপযোগী পরিবেশ
পাঠ-৭.৩ : প্রজনন স্বাস্থ্য সুরক্ষা
পাঠ-৭.৪ : এইচআইভি এবং এইডসকে জানা

পাঠ-৭.১ মানসিক স্বাস্থ্যের বৈশিষ্ট্য ও উপাদান

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি–

- মানসিক স্বাস্থ্য বলতে কী বোঝায় তা বলতে পারবেন;
- মানসিক স্বাস্থ্যের লক্ষণ ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন;
- মানসিক স্বাস্থ্যের উপাদানগুলো উল্লেখ করতে পারবেন।

মানসিক স্বাস্থ্য

শরীর ও মনের দিক থেকে সুস্থ অবস্থা ও পরিবেশের সাথে সুস্থ সংগতি বিধান করাকে মানসিক স্বাস্থ্য বলে। মনোবিজ্ঞানীদের মতে মানুষের সকল আচরণই উদ্দেশ্যমুখী। এ উদ্দেশ্যমুখী আচরণের মূলে রয়েছে কতগুলো চাহিদা। মানুষ যদি বাস্তব জীবনের সকল সমস্যা ও সংকট মেনে নিয়ে তার চাহিদাগুলো স্বল্পতম সংঘর্ষ ও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সম্পন্ন করতে পারে তবে ইতিবাচক আবেগীয় অবস্থার সৃষ্টি হয়, মানসিক তৃপ্তি লাভ হয় এবং সংগতি বিধান সম্ভব হয়। এ সার্থক সংগতি বিধানের মধ্যে দিয়েই মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষা করা হয়। আর যদি কোনো কারণে মানুষ তার চাহিদাগুলো মেটাতে বা পরিতৃপ্ত করতে না পারে তবে নেতিবাচক আবেগীয় অবস্থা দেখা যায়। এর ফলে প্রক্ষোভের সৃষ্টি হয়। এই প্রক্ষোভই মানসিক দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে যার বহিঃপ্রকাশ ঘটে মানুষের আচরণের মাধ্যমে। সুতরাং দেখা যায় যে, মানুষের চাহিদা অর্জিত হলে পরিবেশের সাথে সংগতি বিধান সম্ভব হয় এবং মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষা হয়। WHO (World Health Organization) এর মতানুসারে মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষিত হয়েছে তখনই বলা যায় যখন সে মানসিক, শারীরিক এবং সামাজিক দিক থেকে সুস্থ নিরোগ ও সুখী হয় এবং জীবনের সর্বস্তরেই তার কুশলতা বর্তমান থাকে। WHO মানসিক স্বাস্থ্যকে ব্যাখ্যা করে মানসিক সুস্বাস্থ্য হিসেবে মত দিয়েছেন যে, মানসিকভাবে স্বাস্থ্যবান একজন মানুষ সেই যে তার নিজের ক্ষমতা বুঝতে পারে, জীবনের স্বাভাবিক চাপসমুহের সাথে খাপ খাওয়াতে পারে এবং সমাজে সর্বস্তরে অবদান রাখতে পারে।

মানসিক স্বাস্থ্যের লক্ষণ ও বৈশিষ্ট্য

মানুষ যে কোনো সময় শারীরিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে। শরীরের সাথে মনের একটি আন্তঃসম্পর্ক রয়েছে। শরীর ভাল না থাকলে মনও ভাল থাকেনা। পরিবেশের বিভিন্ন উদ্দীপকের সংগে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার ফলে আমাদের মন কখনো কখনো উৎফুল্ল এবং কখনো দুঃখ ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে। তাই সবসময় মানসিক দিক থেকে পুরোপুরি সুস্থ মানুষ খুঁজে পাওয়া কঠিন। মানসিক স্বাস্থ্য সম্পন্ন বৈশিষ্ট্যগুলো হলো–

১। **শারীরিক ও বৃদ্ধিবৃত্তিক বিকাশঃ** শরীর ভাল না থাকলে মনও ভাল থাকেনা। তাই মনকে ভাল রাখতে হলে অবশ্যই শারীরিকভাবে সুস্থ থাকতে হবে। অন্যদিকে চার পাশের পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলার জন্য চিন্তা করার ক্ষমতা, যুক্তি প্রয়োগ ও বিচার করার ক্ষমতা থাকা আবশ্যক।

২। **আত্মবিশ্বাসঃ** ব্যক্তির দৃঢ় চিত্ত ও আত্মবিশ্বাসী হওয়া মানসিক স্বাস্থ্যের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

৩। **পরিস্থিতি মানিয়ে চলাঃ** মানসিক স্বাস্থ্যের অধিকারী ব্যক্তিরা জীবনে কোথাও পিছপা হয়না। তারা খুব দৃঢ় চিত্তের হয়। মানসিক শক্তির কারণে তারা যে কোনো পরিবেশ মোকাবেলা করতে পারে।

৪। **পরিপূর্ণ আত্মতৃপ্তিঃ** মানসিক স্বাস্থ্যের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো আত্মতৃপ্তি। ব্যক্তির পরিপূর্ণ আত্মতৃপ্তিই হলো মানসিক স্বাস্থ্যের একটি লক্ষণ।

৫। **নিজের চাহিদা সম্পর্কে সচেতনতাঃ** মানসিক সুস্বাস্থ্যের অধিকারী ব্যক্তি তার চাহিদার মাত্রা সম্পর্কে সব সময় সচেতন থাকে। অবাস্তব চাহিদা সৃষ্টি করে সে অসুখী হতে চায়না।

৬। **আত্মমূল্যায়ন ক্ষমতার অধিকারীঃ** মানসিক স্বাস্থ্যের অধিকারীরা সব সময় নিজের আত্মমূল্যায়ন করতে পারে অর্থাৎ তারা নিজেকে মূল্যায়ন করতে পারে।

মানসিক স্বাস্থ্যের উপদান

মানসিক স্বাস্থ্য মানুষের সামগ্রিক স্বাস্থ্যের একটি দিক। মানসিক স্বাস্থ্য হচ্ছে ব্যক্তির মনের ক্ষমতা যার দ্বারা ব্যক্তি সমাজের সাথে সামঞ্জস্য বজায় রেখে চলতে পারে। মানসিক স্বাস্থ্যের উপাদানগুলো হলো–

- সুস্থ রোগমুক্ত শরীর
- ক্রিয়াশীল ও বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি
- আত্মনির্ভরশীলতা
- সচেতন মনোভাব
- পরিবারিক ও সামাজিক জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পূর্ণ অংশগ্রহণ
- পারিবারিক, সামাজিক ও জাতীয় কল্যাণের দিকে সজাগ দৃষ্টি।

শিক্ষার্থীর কাজ	শিশুদের মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষায় বিবেচ্য বিষয় সম্পর্কে লিখুন।

সারাংশ

মানুষের সকল আচরণই উদ্দেশ্যমুখী। এ উদ্দেশ্যমুখী আচরণের মূলে আছে কতগুলো চাহিদা। মানুষ তার বাস্তব জীবনের সকল সমস্যা মেনে নিয়ে তার চাহিদাগুলো সম্পন্ন করতে পারে। তাতে তার মানসিক তৃপ্তি লাভ হয়। পরিবেশের সাথে সংগতি রেখে মনের জটিল প্রক্রিয়াগুলোকে সহজ পথে পরিচালিত করতে পারাই মানসিক স্বাস্থ্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। মানসিক স্বাস্থ্য বলতে কী বোঝায়?
   ক) পরিবেশের সাথে সংগতি রেখে চলতে পারা ও আচরণ নিয়ন্ত্রণ করতে পারা
   খ) নিজের চাহিদা সম্পর্কে অসচেতনতা
   গ) অবাঞ্ছিত ও অসামাজিক আচরণ করা
   ঘ) দৈনন্দিন জীবনে সমস্যা তৈরি করা

২। মানসিক স্বাস্থ্যের বৈশিষ্ট্যগুলো কী?
   i. পরিস্থিতি মানিয়ে চলা
   ii. শারীরিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ না হওয়া
   iii. আত্মবিশ্বাসী ও দৃঢ় চিত্তের হওয়া
   নিচের কোনটি সঠিক?
   ক) i খ) ii
   গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৭.২ শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য গঠনোপযোগী পরিবেশ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি–

- শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য গঠনে পরিবেশের ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবেন।

মানুষের সামগ্রিক স্বাস্থ্যের একটি দিক হচ্ছে মানসিক স্বাস্থ্য। মানসিক স্বাস্থ্য একটি গতিশীল ধারণা। মানসিক স্বাস্থ্যের সুস্থতায় শারীরিক, মনস্তাত্ত্বিক এবং সামাজিক প্রভাব বিদ্যমান থাকে। মানসিক স্বাস্থ্যের লক্ষণগুলো হলো–

- পরিবেশের সাথে সংগতি রেখে যেকোনো প্রতিকূল পরিবেশ মোকাবেলা করতে পারা
- আচরণ নিয়ন্ত্রণ করতে পারা
- দৈনন্দিন জীবনের সমস্যাগুলোকে সহজে সমাধান করতে পারা।
- অবাঞ্ছিত ও অসামাজিক আচরণ থেকে বিরত থাকা। আত্মবিশ্বাসী ও ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন চরিত্রের অধিকারী হওয়া
- মনের জটিল প্রক্রিয়াগুলোকে সহজ ও ঈপ্সিত পথে পরিচালিত করতে পারা।

শিশুকে সুষ্ঠু ভাবে গড়ে তোলার জন্য শরীরিক স্বাস্থ্যের সাথে সাথে মানসিক স্বাস্থ্যেরও বিকাশ প্রয়োজন। শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য গঠনের জন্য পরিবেশের গুরুত্ব অপরিসীম। মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে এরিকসন, ফ্রয়েড, অ্যাডলার প্রমুখ শিশুর প্রথম কয়েক বছরকে ব্যক্তিত্ব বিকাশের ক্ষেত্রে অতীব গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। কারণ ব্যক্তিত্বের সুষ্ঠু বিকাশই মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষার উপায়। শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য গঠনে উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করার উপায় হলো–

১। স্বাস্থ্যকর গৃহ পরিবেশ

স্বাস্থ্যকর গৃহ পরিবেশ রক্ষার ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলো সম্পর্কে জানতে হবে বা সচেতন হতে হবে তা হলো–

ক) স্বাস্থ্যকর স্থানে বাসস্থান নির্বাচনঃ বাসস্থানটি হবে এমন এলাকায় যেখানে আলো বাতাসে পরিপূর্ণ থাকবে। কলকারখানা, বাজার, রেল ষ্টেশন, হাসপাতাল ইত্যাদি শিশুর মনকে অস্থির করে তোলে এবং গৃহের পরিবেশের ক্ষতি করে পরিবেশ দূষণ ঘটায়। তাই শিশুকে যত্নের সাথে গড়ে তুলতে হলে স্বাস্থ্যকর আবাসিক এলাকায় বাসগৃহের স্থান নির্বাচন করতে হবে।

খ) স্বাস্থ্যকর মানসিক পরিবেশঃ শিশুরা অনুকরণ প্রিয়। শিশুর মন থাকে সাদা কাগজের মত। সে যা দেখে তাই অনুকরণ করে। তাই শিশুকে সঠিকভাবে গড়ে তুলতে হলে একটি সুন্দর ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ দরকার। পরিবারের সদস্যদের মধ্যে ভালোবাসা, বিশ্বাস, শ্রদ্ধাবোধ, সহযোগিতা ও সহনশীলতার সম্পর্ক থাকতে হবে। বাসগৃহ হবে সুশৃঙ্খল ও শান্তির নীড়। গৃহের সুন্দর সুস্থ পরিবেশ শিশুর মানসিক বিকাশে সাহায্য করে।

২। মা-বাবার স্বাস্থ্যকর দাম্পত্য জীবন

দৈহিক ও মানসিক সুস্থতা সুষ্ঠু পরিবেশেই বিকশিত হয়। বাবা-মায়ের মধ্যে শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ও ভালোবাসাপূর্ণ পারস্পরিক সম্পর্ক গৃহ পরিবেশকে শান্তিপূর্ণ করে। ফলে শিশু নিরাপত্তা বোধ করে ও আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করে। বাবা-মায়ের বিচ্ছেদ, মৃত্যু, অপরাধ প্রবণতা শিশুর সার্বিক বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করে। ফলে শিশু নানা প্রকার অপরাধে জড়িয়ে পড়ে এবং তাদের আচরণে নানা রকম সমস্যা দেখা দেয়।

৩। শিশুর প্রতি পিতা-মাতার আসক্তি

শিশুর মৌলিক চাহিদার পাশাপাশি অন্যান্য চাহিদা পূরণের মধ্যে দিয়ে শিশু ও পিতামাতার মধ্যে আসক্তি সৃষ্টি হয়, যেমন- স্পর্শ করা, শিশুকে কোলে নেওয়া, আদর স্নেহ করা, খাওয়ানো ইত্যাদির মাধ্যমে শিশু ও পিতা মাতার মধ্যে আসক্তির সৃষ্টি হয়। শিশু পিতামাতার আচার-আচরণ, দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করে এবং তাদেরকে আপন মনে করে। মা বাবার স্নেহ-মমতাপূর্ণ ভালোবাসা ও মৌলিক চাহিদার পরিতৃপ্তি শিশুর মানসিক স্বাস্থ্যরক্ষায় সহায়তা করে।

৪। শাসন পরিচালনা

শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য গঠনে পিতামাতার শাসন পরিচালনা গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে। শিশু বড় হওয়ার সাথে সাথে তার মধ্যে ব্যক্তিত্ববোধ জাগ্রত হয়। পিতামাতা শিশুর মধ্যে অর্থপূর্ণ আচরণ, শৃংখলা বোধ এবং মূল্যেবোধ বিকাশের জন্য নানা ধরনের পরিচালনা পদ্ধতি প্রয়োগ করেন। পিতামাতার অতিরক্ষণশীল আচরণ শিশুর স্বাধীন আগ্রহ ও ইচ্ছাশক্তি দমন করে। শিশু পিতামাতার উপর নির্ভরশীল হয়। সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হয়। পরনির্ভরশীল হওয়া, শিশুর আগ্রহ, ইচ্ছা বা অনিচ্ছার প্রতি পিতা-মাতার অতিমাত্রায় স্বীকৃতিসূচক মনোভাব শিশুকে স্বার্থপর, জেদি, দায়িত্বহীন ও অবাধ্য করে তোলে। তেমনিভাবে শিশুর প্রতি পিতামাতার অবহেলা, উদাসীনতা ও প্রত্যাখ্যান শিশুকে নিরাপত্তাহীন, আস্থাহীন ও অসহায় করে তোলে। শিশুকে সবসময় শাসন করলে, বাধা নিষেধ ও নিয়ন্ত্রণ আরোপ করলে শিশুর মনে বিদ্রোহের সৃষ্টি হয় যা তাকে অসামাজিক কাজে লিপ্ত করে। অতিরিক্ত শাসন ও নেতিবাচক আচরণ শিশুর মনের স্বাভাবিক বিকাশ ব্যাহত করে, তার মানসিক স্বাস্থ্য বিঘ্নিত হয়। শিশু পরিচালনায় শিশুকে এমনভাবে শিক্ষা দেওয়া উচিত যাতে শিশু নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ অর্জন করতে শেখে। শিশুকে ভালো কাজের জন্য পুরস্কার ও মন্দ কাজের জন্য শাস্তি সম্পর্কে সচেতন করতে হবে।

৫। শিশুর মৌলিক চাহিদা পূরণ

শিশু কতগুলো মৌলিক চাহিদা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে, যেমন- দৈহিক চাহিদা: খাদ্য, পানি, আবাসস্থল, আলো-বাতাস, নিদ্রা, মলমূত্র নিঃসরণ ইত্যাদি; মানসিক চাহিদা: নিরাপত্তা, নিশ্চয়তা, স্বীকৃতি, অধিকার বোধ, স্নেহ-ভালোবাসা, আত্মপরিচিতি ইত্যাদি চাহিদাগুলোর তৃপ্তিকর অনুভূতি মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষায় প্রয়োজন।

৬। বয়ঃসন্ধিকালে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি

বয়ঃসন্ধিকাল ছেলেমেয়েদের জন্য সবচেয়ে বিপজ্জনক সময়। এ সময় তারা মা বাবার চেয়ে বন্ধু বান্ধবের প্রতি বেশি নির্ভরশীল হয়। তাই মা-বাবা ছেলেমেয়ের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি করতে হবে। তাদেরকে ভালো ও মন্দের দিক নির্দেশনা দিতে হবে। সতর্ক করতে হবে যাতে তারা বন্ধু নির্বাচনে সতর্ক ও সচেতন হয়। বাবা মায়ের প্রতি যাতে তারা আস্থাশীল হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

৭। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষক

শিক্ষকের আচরণ ও পাঠ্যক্রম শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বিদ্যালয়ের বিশৃংখল পরিবেশ, কঠিন পাঠ্যক্রম, শ্রেণিকক্ষে কঠোর শাস্তি প্রদান শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ন করে। একজন শিক্ষক সহজেই নিঃসংগ ও আত্মবিশ্বাসহীন শিশুকে সহযোগিতা করে আত্মবিশ্বাসী করে তুলতে পারে যাতে সে পরবর্তীকালে আত্মবিশ্বাসী হয়ে সবার সাথে সুস্থ-স্বাভাবিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারে। সুতরাং পরিবারের পাশাপাশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভূমিকাও এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ।

৮। সামাজিক প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা

শিশুর জন্য স্বাস্থ্যকর পারিবারিক ও সামাজিক পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে। শিশুর বিদ্যালয়ের পরিবেশ স্বাস্থ্যসম্মত হতে হবে। শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষায় বিভিন্ন বাধার প্রতি সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। শিশুর মানসিক সুস্বাস্থ্য রক্ষায় পারিবারিক অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা দূর করতে হবে। শিশুর নিরাপত্তাহীনতা দূর করার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা আমাদের দায়িত্ব। শিশু নির্যাতন সম্পর্কে সকলকে সচেতন করতে হবে।

শিশুরাই আমাদের আগামী দিনের ভবিষ্যত। তাই তাদের জন্য সুস্থ, সুন্দর পরিবেশ তৈরি করতে হবে। শরীর ও মন যেহেতু ওতোপ্রোতভাবে জড়িত, তাই শুধু শারীরিক স্বাস্থ্য নয় মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নয়নেও সকলের সচেতনতা আবশ্যক।

শিক্ষার্থীর কাজ	শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষায় উপযুক্ত পরিবেশের বর্ণনা দিন।

সারাংশ

শারীরিক স্বাস্থ্যের প্রতি মানুষ যতটা সচেতন, মানসিক স্বাস্থ্যের প্রতি ঠিক ততোটা সচেতন নয়। শরীর ও মন যেহেতু এক তাই মানসিক স্বাস্থ্যকে বাদ দিয়ে একজন মানুষ সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হতে পারেনা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। মানসিক স্বাস্থ্য বলতে বোঝায়–
i. মনের দিক থেকে সুস্থ অবস্থা
ii. ইতিবাচক আবেগীয় অবস্থা
iii. সুস্থ সংগতি বিধান
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

২। মানসিক স্বাস্থ্যের উপাদানগুলো হলো–
i. রোগমুক্ত সুস্থ শরীর
ii. পরিপূর্ণ আত্মবিশ্বাস
iii. অসচেতন মনোভাব
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) ii ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৩। বয়ঃসন্ধিকালে কাদের উপর নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পায়?
ক) পিতা-মাতা খ) বন্ধুবান্ধব
গ) ভাইবোন ঘ) শিক্ষক

৪। মানসিক সুস্বাস্থ্যের অধিকারী ব্যক্তিকে হতে হবে–
i. আত্মবিশ্বাসী
ii. আত্মমূল্যায়ন ক্ষমতার অধিকারী
iii. মেধাবী
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) ii ও iii
গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৭.৩ প্রজনন স্বাস্থ্য সুরক্ষা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি–

- প্রজনন স্বাস্থ্য বলতে কী বোঝায় তা বর্ণনা করতে পারবেন;
- প্রজনন স্বাস্থ্যের উপাদান বলতে পারবেন;
- প্রজনন স্বাস্থ্য রক্ষার উপায় ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

নিরাপদ ও উন্নত জীবন যাপনের জন্য প্রত্যেকেরই প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কে মৌলিক ধারণা থাকা অত্যন্ত জরুরি। সন্তান জন্মদানের সঙ্গে যুক্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের স্বাস্থ্যের বিষয়টিই হচ্ছে প্রজনন স্বাস্থ্য। মানুষের সামগ্রিক স্বাস্থ্যের একটি বিশেষ অংশ হচ্ছে প্রজনন স্বাস্থ্য। এছাড়াও প্রজনন স্বাস্থ্য বলতে সেই স্বাস্থ্যকে বোঝায় যার মাধ্যমে মানুষ সুস্থ ও নিরাপদভাবে শারীরিক সম্পর্ক বজায় রাখতে পারে। শিশু থেকে বৃদ্ধ সকলেরই প্রজনন স্বাস্থ্য সেবার প্রয়োজন হয়।

এ প্রসঙ্গে ১৯৯৪ সালের ৫ থেকে ১৩ই সেপ্টেম্বর কায়রোতে অনুষ্ঠিত ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স অন পপুলেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (ICPO)-এর ঘোষণানুসারে প্রজনন স্বাস্থ্যের আওতাভুক্ত কতিপয় বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে–

১। জনগণের সন্তোষজনক ও নিরাপদ যৌন জীবন এবং যৌন স্বাস্থ্যরক্ষা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে নারী-পুরুষের অধিকার সমান।

২। প্রজনন স্বাস্থ্যের মধ্যে যৌন স্বাস্থ্য অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সন্তান উৎপাদনের ক্ষমতায় ব্যক্তির স্বাধীনতা বর্তমান।

৩। সন্তান উৎপাদনের স্বাধীনতা কয়েকটি অধিকারের সাথে সম্পর্কিত। যেমন– পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি সম্পর্কে নারী পুরুষের জানার অধিকার।

৪। পছন্দ অনুযায়ী নিরাপদ, কার্যকর ও সাধ্যানুসারে গ্রহণযোগ্য পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণের অধিকার।

WHO-এর মতে "প্রজনন স্বাস্থ্য বলতে শুধু প্রজনন তন্ত্রের কাজ এবং প্রজনন প্রক্রিয়ার সাথে সম্পর্কিত রোগ, অসুস্থতার অনুপস্থিতিকেই বোঝায়না, এটি শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক কল্যাণকর এবং পরিপূর্ণ সুস্থ অবস্থার মধ্যে দিয়ে প্রজনন প্রক্রিয়া সম্পাদনের একটি অবস্থাকে বোঝায়। প্রজনন তন্ত্রের সুরক্ষা মানুষের জীবনের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু আমাদের দেশে প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কে বেশিরভাগ মানুষেরই সচেতনতার অভাব রয়েছে। বাংলাদেশের ৫০ শতাংশ নারী প্রজনন তন্ত্রের বিভিন্ন সমস্যায় ভোগেন। ২৩ শতাংশ নারী ২০ বছর বয়সের আগেই গর্ভধারণ করেন। প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী একজন মহিলার শুধু গর্ভকালীন, প্রসবকালীন ও প্রসব পরবর্তী সময়ে প্রজনন স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিশেষ যত্নের প্রয়োজন। বর্তমানে এই ধারণার অনেক পরিবর্তন এসেছে কারণ, একটি শিশুর মায়ের গর্ভ থেকে শুরু করে শৈশব, কৈশোর, যৌবন ও বৃদ্ধ বয়স অর্থাৎ জীবন বিকাশের প্রতিটি স্তরেই প্রজনন স্বাস্থ্যের বিষয়টি জড়িত। প্রজনন স্বাস্থ্যের সুরক্ষা মানুষের জীবনের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সন্তান জন্মদানের প্রক্রিয়ার সংগে সব নারীরা ওতোপ্রোতভাবে দীর্ঘ সময় ধরে জড়িত থাকে। তাই নারীর প্রজনন স্বাস্থ্য পরিচর্যার ব্যাপারে সবাইকে সচেতন হতে হবে।

প্রজনন স্বাস্থ্য সুরক্ষার উপাদান

১। **বয়ঃসন্ধিকালে প্রজনন স্বাস্থ্যঃ** প্রজনন স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য বয়ঃসন্ধিকালে ১১ থেকে ১৩ বছর বয়সে মেয়েদের ঋতুস্রাব ও ছেলেদের স্বপ্নদোষ ঘটার সময় থেকেই এসব সম্পর্কিত স্বাস্থ্যবিধিসমূহ মেনে চলতে হবে। কারণ এসময় থেকেই ছেলে ও মেয়েরা প্রজননক্ষম হয়ে ওঠে।

২। **উপযুক্ত বয়সে গর্ভধারণঃ** প্রজনন স্বাস্থ্য সুরক্ষার দ্বিতীয় উপায় হচ্ছে মেয়েদের ২০ বছর বয়সের আগে গর্ভধারণ না করা।

৩। **নিরাপদ মাতৃত্বঃ** নিরাপদ মাতৃত্ব বলতে বোঝায় গর্ভকালীন, প্রসবকালীন ও প্রসবোত্তর সময়ে মায়ের সুস্থতা বজায় রাখা। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গর্ভকালীন অনেক মা পর্যাপ্ত খাদ্য, প্রয়োজনীয় চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যসেবা পায় না। অল্প বয়সে

গর্ভধারণ করার ফলে অসুস্থ হয় বা মৃত্যু ঘটে। তাছাড়া অশিক্ষা, কুশিক্ষা ও সামাজিক পশ্চাৎপদতা মা ও শিশুর অকাল মৃত্যুর জন্য দায়ী। গর্ভাবস্থায় ও প্রসুতি অবস্থার ক্ষেত্রে প্রজনন স্বাস্থ্যসেবার ভাল জ্ঞান থাকা এবং এ সেবা প্রদান ও গ্রহণ করা অত্যন্ত জরুরি। গর্ভকালীন স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করে সেবা ও উপদেশ গ্রহণ করতে হবে।

৪। **শিশুর জন্মপূর্ব যত্নঃ** শিশুর জন্মপূর্ব যত্ন বলতে গর্ভবতী মায়ের যত্ন বোঝায়। এই যত্নের মধ্যে রয়েছে পর্যাপ্ত পরিমাণে পুষ্টিমানসম্পন্ন খাদ্য গ্রহণ করা, পর্যাপ্ত ঘুম ও বিশ্রাম নেয়া, হালকা কাজ করা, মন প্রফুল্ল ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা, ধূমপান ও মাদক থেকে বিরত থাকা বা পরিহার করা এবং রোগ ব্যাধির সংক্রমণ থেকে সতর্ক থাকা।

৫। **নবজাতকের পরিচর্যাঃ** শিশুর জন্মের পর ১৪ দিন বয়স পর্যন্ত তাকে নবজাতক বলা হয়। শিশুর জন্মের পর পরই তাকে শাল দুধ দিতে হয় এবং সঠিক পরিমাণে মায়ের দুধ অর্থাৎ পুষ্টিকর খাদ্যের ব্যবস্থা করতে হয়। এই সময় তাকে প্রয়োজনীয় সেবা ও টিকা প্রদান করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

৬। **মা ও শিশুর পুষ্টিঃ** আমাদের দেশের অধিকাংশ শিশু ও মা অপুষ্টিতে ভোগে। এর প্রধান কারণ পুষ্টি সম্পর্কে অজ্ঞতা। গর্ভবতী মা ও প্রসূতি মা অপুষ্টিতে ভোগেন বলেই শিশু পুষ্টিহীনতায় ভোগে। নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে গর্ভধারণ, পুষ্টি বিষয়ে সচেতনতা ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে পুষ্টি অবস্থার উন্নয়ন প্রয়োজন।

৭। **অনিরাপদ গর্ভপাত প্রতিরোধঃ** মাতৃ মৃত্যুর প্রধান কারণ হলো অনিরাপদ গর্ভপাত। কোনো কারণে গর্ভপাতের প্রয়োজন হলে অশিক্ষিত গ্রাম্য স্বাস্থ্যকর্মী, কবিরাজ বা অন্যদের নিকট থেকে কোনো প্রকার সেবা গ্রহণ না করে সরকারি কর্মসূচির আওতায় ব্যবস্থা নেওয়া আবশ্যক।

৮। **পরিবার পরিকল্পনাঃ** পরিবার পরিকল্পনা হচ্ছে পরিকল্পিতভাবে সন্তান নেয়া। প্রজননে সক্ষম সকল দম্পতিরই পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করা উচিত। নারী ও পুরুষ উভয়েরই জন্ম নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি ও উপায়সমূহ সম্পর্কে সঠিক দক্ষতা ও জ্ঞান থাকা একান্ত জরুরী।

৯। **প্রজনন তন্ত্রের বিভিন্ন রোগের সেবা ও রোগ প্রতিরোধঃ** প্রজনন তন্ত্রের সংক্রামক রোগ, যৌন রোগ, প্রজনন অঙ্গের ক্যান্সারসহ সব রকম রোগ এবং এইচআইভি/এইডস এসব রোগের সেবা প্রদানকারী বিভিন্ন হাসপাতাল, ক্লিনিক ও সংস্থার সেবা প্রদান সম্পর্কিত তথ্য জানতে হবে এবং প্রয়োজনমতো সেবা গ্রহণ করতে হবে।

১০। **মেনোপজজনিত সমস্যাঃ** সাধারণত নারীরা ১৫-৫৫ বয়স পর্যন্ত গর্ভধারণ ও প্রজননে সক্ষম। ৫০-৫৫ বছর বয়সে বা তার আগেই অনেকের মাসিক স্থায়ীভাবে বন্ধ হযে যায়। এ অবস্থাকে মেনোপজ বলা হয়। এ সময় বিভিন্ন ধরনের শারীরিক ও মানসিক সমস্যা দেখা দিতে পারে। যথাযথ সেবার মাধ্যমে এসব সমস্যা সমাধান করতে হবে।

প্রজনন স্বাস্থ্য রক্ষার উপায়

বর্তমানে প্রজনন স্বাস্থ্যের ধারণা শুধু মাতৃস্বাস্থ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। সব বয়সের মানুষের জন্য প্রজনন স্বাস্থ্য রক্ষা করা প্রয়োজন। মেয়েদের ক্ষেত্রে ২০ বছরের পূর্বে এবং ৩৫ বছরের পরে গর্ভধারণ না করলে প্রসবকালীন ঝুঁকিমুক্ত থাকা যায়। প্রজননকালীন ও এর আগে বা পরে প্রজনন তন্ত্রের কোনো রোগ দেখা দিলে সাথে সাথেই ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ করলে সংক্রামক রোগ এবং যৌন রোগের ঝুঁকি থেকে মুক্ত থাকা যায়। তাই প্রজনন স্বাস্থ্য রক্ষা করার উপায় সম্পর্কে সবাইকে অবগত থাকতে হবে। প্রজনন স্বাস্থ্য রক্ষার উপায়গুলো হলো:

১। প্রজনন স্বাস্থ্য রক্ষায় সবার সচেতন হওয়া প্রয়োজন। এজন্য বাল্যবিবাহ রোধ করা।
২। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা।
৩। প্রজনন নিরাপত্তা ও প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ক সব কুসংস্কার মুক্ত থাকা।
৪। গর্ভকালীন সময়ে শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ থাকার বিষয়ে যত্নবান হওয়া।
৫। প্রসূতিকালীন সময়ে অধিক যত্নবান ও চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ।
৬। প্রজনন স্বাস্থ্যের পরিচর্যার অভাবে নারীদের জরায়ুর মুখে সার্ভিস্কে, স্তনে, ডিম্বাশয়ে ক্যান্সার হতে পারে এ ক্ষেত্রে ক্যান্সার না হওয়ার জন্য টিকা দেওয়া বা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
৭। পরিবার পরিকল্পনার বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা।
৮। ধর্মীয় রীতিনীতি ও সামাজিক অনুশাসন মেনে চলা।
৯। ঝুঁকিপূর্ণ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান ও যৌন হয়রানি দমন করা এবং শাস্তি নিশ্চিত করা।

১০। স্বাস্থ্য ও শিক্ষা মন্ত্রনালয়সহ সংশ্লিষ্ট সকলকে এ ব্যাপারে উদ্যোগী হওয়া। এছাড়া জেলা হাসপাতাল, মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও ইউনিয়ন পর্যায়ে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রগুলোতে প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে হবে। নারী, পুরুষ, সমাজ ও পরিবারের সচেতনতা, যথাযথ জ্ঞান ও সঠিক আচরণের মধ্য দিয়েই প্রজনন স্বাস্থ্যের সুরক্ষা সম্ভব।

শিক্ষার্থীর কাজ	প্রজনন স্বাস্থ্য রক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আপনার মতামত লিখুন।

সারাংশ

সন্তান জন্মদানের সংগে যুক্ত অংগ প্রত্যঙ্গের সুস্থতার বিষয়টিই হচ্ছে প্রজনন স্বাস্থ্য। এক্ষেত্রে নারী এবং পুরুষ উভয়ের দেহ ও মনকে সুস্থ রাখার জন্য অবশ্যই প্রজনন তন্ত্রের পরিচর্যা প্রয়োজন। প্রজনন স্বাস্থ্য বলতে সেই স্বাস্থ্যকেই বোঝায় যার মাধ্যমে মানুষ সুস্থ ও নিরাপদভাবে শারিরীক সম্পর্ক বজায় রাখতে পারে। প্রজনন তন্ত্রের সুরক্ষা মানুষের জীবনের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। প্রজনন স্বাস্থ্যের উপাদান কোনটি?
ক) শিশুর জন্মপূর্ব যত্ন ও নবজাতকের পরিচর্যা
খ) পরিবেশের সাথে সংগতি বিধান
গ) স্বাস্থ্যকর বাসস্থান নির্বাচন
ঘ) পিতা-মাতার স্বাস্থ্যকর দাম্পত্য জীবন

২। বাংলাদেশে কত শতাংশ নারী ২০ বছর বয়সের আগেই গর্ভধারণ করে?
ক) ২২%
খ) ২৩%
গ) ২৪%
ঘ) ২৫%

৩। প্রজনন স্বাস্থ্যের প্রয়োজন, কারণ–
i. প্রসবকালীন জটিলতা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য
ii. যৌনবাহিত রোগ হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য
iii. জরায়ুর ক্যান্সার থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i
খ) i ও ii
গ) i ও iii
ঘ) i, ii ও iii

৪। নিরাপদ মাতৃত্বের সুস্থতা বলতে বোঝায়–
i. গর্ভকালীন সুস্থতা
ii. প্রসবকালীন সুস্থতা
iii. প্রসবোত্তর সুস্থতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii
খ) i ও iii
গ) ii ও iii
ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৭.৪ এইচআইভি এবং এইডসকে জানা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি–

- এইচআইভি বা এইডস এর কারণ বা লক্ষণ বর্ণনা পারবেন;
- এইডস প্রতিরোধের উপায় ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- এইচআইভি বা এইডস প্রতিরোধে সরকার, সমাজ ও পরিবারের ভূমিকা সম্পর্কে বলতে পারবেন।

এইডস একটি মারাত্মক ঘাতক ও সংক্রামক ব্যাধি। এ রোগের ভাইরাসের নাম HIV। এ ভাইরাস শরীরে প্রবেশ করলে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেতে থাকে। বর্তমান বিশ্বে এইডস বহুল আলোচিত বিষয়। ১৯৮১ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সর্বপ্রথম শনাক্ত করা হয়। পরে জানা যায়, সত্তরের দশকে আফ্রিকায় এইডসের বিস্তার ঘটে। এইডস (AIDS) এবং এইচআইভি (HIV) দু'টি ইংরেজি শব্দ। Acquired Immune Deficiency Syndrome সংক্ষেপে AIDS নামে পরিচিত।

A=Acquired - অর্জিত

I=Immune - রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা

D=Deficiency - ঘাটতি

S=Syndrome - লক্ষণ

AIDS-এর বাংলা অর্থ হলো- "অর্জিত রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ঘাটতির লক্ষণ সমষ্টি"। এই রোগে আক্রান্ত হলে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ধীরে ধীরে হ্রাস পায়। ফলে যে কোনো রোগ জীবাণু সহজেই দেহকে আক্রমণ করে। যেমন- সর্দি-কাশি, ডায়রিয়া, যক্ষ্মা ইত্যাদি রোগের জীবাণু দেহে বাসা বাঁধে এবং মানুষ আস্তে আস্তে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

Human Immune Deficiency Virus কে সংক্ষেপে HIV বলে, এটিই এইডসের ভাইরাস। HIV আক্রান্ত মানুষ বাহক হিসাবে কাজ করে। এটি মানুষের রক্ত প্রণালির সাথে মিলে কিছুদিন যুক্ত থাকার পর ধীরে ধীরে নানা উপসর্গে প্রকাশ পেতে থাকে। HIV দ্বারা আক্রান্ত মানুষ কয়েক মাস থেকে কয়েক বছর লক্ষণহীন অবস্থায় জীবনযাপন করতে পারে। একসময় রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে- মৃত্যুমুখে পতিত হওয়া অবধারিত।

এইডস রোগের লক্ষণ

এ রোগের লক্ষণগুলো হলো–

১। শরীরে প্রতিনিয়ত জ্বর থাকে
২। শরীরের ওজন অস্বাভাবিকভাবে হ্রাস পায়
৩। শুকনো কাশি, পেটের পীড়া, চর্মরোগ ইত্যাদি দেখা দেয়
৪। মুখে, জিভে, ঠোঁটে ঘা
৫। অত্যধিক দুর্বলতা ও স্মৃতিশক্তি কমে যাওয়া
৬। অনিদ্রা, অত্যধিক শরীর ঘামা
৭। মস্তিষ্কে প্রদাহ ইত্যাদি।

কোনো ব্যক্তির এসব লক্ষণ দেখা দিলে অনতিবিলম্বে ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে রক্ত পরীক্ষার ব্যবস্থা করে এইচআইভি কিনা তা নিশ্চিত হতে হবে। প্রতিকারহীন এইচআইভি/এইডস রোগের চরম পরিণতি মৃত্যু। তাই সকলকে বিশেষ করে অল্প বয়সী ছেলে মেয়েদেরকে এ ব্যাপারে বিশেষভাবে সচেতন হতে হবে এবং সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। এইচআইভি এবং এইডস সংক্রমণ যেসব কারণে হয়ে থাকে সেগুলোকে "এইচআইভি এবং এইডস-এর ঝুঁকি" বলা হয়। এ ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে–

ক) মাদক গ্রহণ বা কোনো প্রয়োজনে ইঞ্জেকশনের একই সুঁচ ও সিরিঞ্জ একাধিক ব্যক্তি কর্তৃক ব্যবহার।
খ) অপরীক্ষিত রক্ত গ্রহণ।
গ) অপারেশনের সময় অপরিশোধিত জীবাণুযুক্ত যন্ত্রপাতি ব্যবহার।
ঘ) এইডস আক্রান্ত মায়ের সন্তান গ্রহণ।
ঙ) অনিরাপদ দৈহিক সম্পর্ক।
চ) এইচআইভি আক্রান্ত মায়ের দুধ শিশু পান করলে।

এইডস প্রতিরোধে সরকার, সমাজ ও পরিবারের ভূমিকা

এইচআইভি সংক্রমিত ব্যক্তির প্রতি পরিবার, সমাজ ও সরকারের আচরণ যেমন হওয়া উচিত–

- এইচআইভি আক্রান্ত ব্যক্তির সাথে সামাজের অন্য দশজনের মত স্বাভাবিক আচরণ করতে হবে।
- আক্রান্ত ব্যক্তির সাথে কোনো রকম অমানবিক আচরণ করা উচিত নয়।
- এইডস আক্রান্ত হওয়ার বিষয়ে গোপনীয়তা রক্ষা করতে হবে।
- এলাকায় তার চলাফেরার সব রকম বাধা দূর করার ব্যবস্থা নিতে হবে।
- যে কোনো সামাজিক ও পারিবারিক উৎসবে তাকে অংশগ্রহণের সুযোগ দিতে হবে।
- আক্রান্ত ব্যক্তিকে "এক ঘরে" করে রাখা চলবেনা।
- কর্মস্থলেও তাকে স্বাভাবিক সুযোগ-সুবিধা দিতে হবে।
- পরিবারের সদস্যদের ঝুঁকিপূর্ণ আচরণ পরিহার করতে বলতে হবে।
- ধর্মীয় ও সামাজিক অনুশাসন, রীতিনীতি মেনে চলার পরামর্শ দিতে হবে।
- এইচআইভি এবং এইডস সম্পর্কে সচেতন করতে হবে।

এছাড়াও সরকারিভাবে বাংলাদেশ সরকার ১৯৮৫ সালে জাতীয় এইডস কমিটি গঠন করে। জাতীয় এইডস কমিটি স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রনালয়ের আওতায় কাজ করে এবং এইডস প্রতিরোধ সম্পর্কে পরামর্শ দেয়। ১৯৮৮ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার আর্থিক সহয়তায় স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনার আওতায় এইডস প্রতিরোধের কর্মকান্ড আরম্ভ হয়। বিগত শতাব্দীর নব্বই দশক থেকে ব্যাপকভাবে বাংলাদেশ সরকার এইডস নিয়ন্ত্রণে জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি ও পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, এগুলোর মধ্যে প্রধান হচ্ছে–

- ১৯৯৭ সালে এইচআইভি/এইডস এবং যৌনরোগ বিষয়ক জাতীয় নীতি প্রণয়ন ও অনুমোদন।
- ২০০৫ সালে এইচআইভি/এইডস বিষয়ক জাতীয় কৌশলগত পরিকল্পনা অনুমোদিত ও গৃহীত হয়। এই পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্য বাংলাদেশে এইচআইভি সংক্রমনের ঝুঁকি প্রতিরোধ, এইচআইভি সংক্রামিতদের সেবাদান ও এইচআইভি/এইডস এর প্রভাব হ্রাস করা।
- নিরাপদ রক্ত সঞ্চালন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ২০০২ সালে এ বিষয়ে আইন পাস। ইতোমধ্যে দেশে ৯৮টি রক্ত পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। এসব কেন্দ্রে রক্তে এইচআইভি/এইডসসহ অন্যান্য যৌন রোগের উপস্থিতি নির্নয় করা হয়।
- বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর জন্য সচেতনতা কর্মসূচি ও ওরিয়েন্টেশন কর্মশালা পরিচালনা।
- দেশব্যাপি বিশ্ব এইডস দিবস পালনের ব্যবস্থা করা।
- এইচআইভি/এইডস বিষয়ে দেশের সার্বিক পরিস্থিতি জানার জন্য নিয়মিত নিরীক্ষণমূলক জরিপ পরিচালনা।
- দেশে এইচআইভি এইডস বিষয়ক কার্যক্রমের প্রধান সমন্বয়কারী সংস্থা হচ্ছে জাতীয় এইডস/এসটিডি প্রোগ্রাম। জাতীয় এইডস কমিটি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং মন্ত্রণালয়াধীন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সমন্বয়ে এই সংস্থা গঠিত। এই সংস্থা বহুবিধ ও বহুমাত্রিক কার্যক্রমের মাধ্যমে এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধে সংক্রমিতদের সেবাদান ও এর প্রভাব হ্রাসের ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

শিক্ষার্থীর কাজ	এইচআইভি এবং এইডস সম্পর্কে সচেতনতামূলক পোস্টার তৈরি করুন।

সারাংশ

এইচআইভি বা এইডস একটি মরণব্যাধি। এ ব্যাধি থেকে মুক্ত থাকার জন্য কিছু নিয়ম কানুন ও সামাজিক ধর্মীয় বিধি নিষেধ মেনে চলতে হবে। যেমন- ঝুঁকিপূর্ণ আচরণ পরিহার করতে হবে। আবেগ ও কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে কোন ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করা যাবে না। ধর্মীয় ও সামাজিক অনুশাসন, রীতিনীতি মেনে চলতে হবে। নেশা করা বা মাদকাসক্ত হওয়া অনৈতিক দৈহিক বা যৌন সম্পর্ক ইত্যাদি কোনো ধর্ম বা সমাজই অনুমোদন করে না। সামাজিকভাবে এগুলো অত্যন্ত গর্হিত অপরাধ। তাই এসব আচরণ থেকে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১। এইডস রোগ প্রথম কোথায় শনাক্ত হয়?

ক) আমেরিকা খ) কানাডা
গ) যুক্তরাজ্য ঘ) ভারত

২। HIV কী?

ক) ছত্রাক খ) প্রটোজোয়া
গ) ভাইরাস ঘ) ব্যাকটেরিয়া

৩। এইডস কোন ধরনের রোগ?

ক) একটি সংক্রামক রোগ খ) পানিবাহিত রোগ
গ) অপুষ্টিজনিত রোগ ঘ) ভাইরাসজনিত রোগ

৪। HIV কোন রোগের ভাইরাসের নাম?

ক) জন্ডিস খ) এইডস
গ) ক্যান্সার ঘ) আমাশয়

চূড়ান্ড় মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। সাথীর বয়স ১২ বছর। প্রায়ই তাকে বিষন্ন, হতাশ ও একাকী মনে হয়। মা সাথীর মধ্যে শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন লক্ষ্য করেন। মা সাথীকে প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কে ধারণা দেন এবং চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যান। চিকিৎসক বললেন, "শারীরিক স্বাস্থ্যের সাথে মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষা করা আবশ্যক এবং এক্ষেত্রে সকলেরই সচেতন হওয়া উচিত।"

ক) AIDS এর সম্পূর্ণ নাম কী?
খ) মানসিক স্বাস্থ্য বলতে কী বোঝায়?
গ) উদ্দীপকে সাথীকে মা যা সম্পর্কে ধারণা দিলেন তা ব্যাখ্যা করুন।
ঘ) উদ্দীপকে উল্লেখিত চিকিৎসকের উক্তিটি বিশ্লেষণ করুন।

২। সাহিদার চার সন্তান। তার বয়স এখন পঁচিশ বছর। স্বামী স্বল্প আয়ের কর্মচারি। ঘন ঘন সন্তান ও পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে সাহিদাকে ৪০ বছরের বেশি বয়সী মনে হয়। স্বামীর স্বল্প আয়ে যেখানে সন্তানদের খাদ্য যোগাড় করা কঠিন সেখানে নিজের চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য রক্ষার বিষয়টি তার কাছে ছিল স্বপ্নের মত। তাছাড়া শারীরিক অক্ষমতা ও উদাসীনতার জন্য সে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছিল।

ক) প্রজনন স্বাস্থ্য কী?
খ) প্রজনন স্বাস্থ্যের সুস্থ্যতার জন্য প্রভাব বিস্তারকারী বিষয়গুলো সম্পর্কে ধারণা থাকা প্রয়োজন, ব্যাখ্যা দিন।
গ) উদ্দীপকে সাহিদার পরিবারে কী ধরনের স্বাস্থ্য সেবা প্রয়োজন তা ব্যাখ্যা করুন।
ঘ) উদ্দীপকের আলোকে সাহিদার সুস্থতা রক্ষার উপায় বর্ণনা করুন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। মানসিক স্বাস্থ্য বলতে কী বোঝেন?
২। প্রজনন স্বাস্থ্য বলতে কী বোঝায়?
৩। AIDS বলতে কী বোঝেন?
৪। প্রজনন স্বাস্থ্যের উপাদানগুলো সংক্ষেপে লিখুন।

রচনামূলক প্রশ্ন

১। প্রজনন স্বাস্থ্য ও মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষার উপায়গুলো বর্ণনা করুন।
২। মানসিক স্বাস্থ্যের লক্ষণগুলো আলোচনা করুন।
৩। এইচআইভি বা এইডসের ঝুঁকি প্রতিরোধের উপায়গুলো বর্ণনা করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.১ : ১। ক ২। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.২ : ১। খ ২। ঘ ৩। খ ৪। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.৩ : ১। ঘ ২। খ ৩। ঘ ৪। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.৪ : ১। গ ২। গ ৩। ঘ ৪। খ